

নারিকেল

নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। ব্যবহার বৈচিত্র্যে এটি একটি অতুলনীয় উদ্ভিদ। নারিকেল গাছের প্রতিটি অঙ্গই কোন না কোন কাজে লাগে। খাদ্য-পানীয় থেকে শুরু করে গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম, পত্ত খাদ্য ইত্যাদি উপকরণ নারিকেল গাছ থেকে পাওয়া যায়। এজন্য নারিকেল গাছকে স্বর্গীয় বৃক্ষ বলা হয়।

বাংলাদেশের সব জেলাতেই নারিকেল জন্মায়। তবে উপকূলীয় জেলাসমূহে এর উৎপাদন বেশি। বাংলাদেশে বর্তমানে নারিকেলের বার্ষিক উৎপাদন ৩ লক্ষ ৮১ হাজার টন। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট নারিকেলের ৩৫-৪০% ডাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের শাঁসে স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। ডাবের পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ রয়েছে। খাবার স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ডাবের পানি অত্যন্ত কার্যকরী।



নারিকেলসহ নারিকেল গাছ

নারিকেলের জাত

বারি নারিকেল-১

নারিকেলের জাত হিসেবে 'বারি নারিকেল-১' বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে অনুমোদিত হয়। গাছ মধ্যম আকৃতির এবং সারা বছর ফল ধরে। পূর্ণ বয়স্ক প্রতিটি গাছে ফলের সংখ্যা ৬৫-৭৫টি। ফল ডিম্বাকার এবং পরিপক্ক ফলের ওজন ১২০০-১৩০০ গ্রাম। প্রতিটি নারিকেলের খোসার ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। পানির পরিমাণ ২৭০-২৯০ মিলি। শাঁসের ওজন ৩৭০-৩৯০ গ্রাম এবং শাঁসের পুরুত্ব ৯-১১ মিমি। তেলের পরিমাণ ৫৫-৬০%। এ জাতটি কাণ্ড ঝরা রোগ সহনশীল। দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি নির্বাচন করা হয়। জাতটি দেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।



বারি নারিকেল-১



বারি নারিকেল-১ এর ফলসহ গাছ

বারি নারিকেল-২

বিদেশ থেকে প্রবর্তিত 'বারি নারিকেল-২' জাতটি বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে অনুমোদিত হয়। নারিকেলের এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত যা সারা বছর ফল দেয়।

পূর্ণ বয়স্ক গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬৫-৭৫টি। ফলের আকৃতি প্রায় ডিম্বাকার। প্রতিটি ফলের ওজন ১.৫-১.৭ কেজি ও পানির পরিমাণ ৩৩০-৩৪৫ মিলি। ফলে শাঁসের পুরুত্ব ১০-১২ মিমি। তেলের পরিমাণ ৫০-৫৫%।

পাতার দাগ রোগ সহনশীল। বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষের উপযোগী। তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য এ জাত বেশি উপযোগী।



বারি নারিকেল-২



বারি নারিকেল-২ এর ফলসহ গাছ

নারিকেলের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

নারিকেল গাছের জন্য নিকাশযুক্ত দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম।

রোপণের সময়

মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-আশ্বিন (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) মাস।

রোপণের দূরত্ব

৬ × ৬ মিটার হিসেবে হেক্টরপ্রতি ২৭৮টি চারার প্রয়োজন হয়।

গর্তের পরিমাপ

১ × ১ × ১ মিটার।

সারের পরিমাণ

নিরূপ হারে গর্তে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত
টিএসপি	২৫০ গ্রাম
এমওপি	৪০০ গ্রাম
গোবর	২০-৩০ কেজি
জিংক সালফেট	১০০ গ্রাম
বরিক এসিড	৫০ গ্রাম

চারা রোপণ ও পরিচর্যা

গর্তের মাঝখানে নারিকেল চারা এমনভাবে রোপণ করতে হবে যাতে নারিকেলের খোসা সংলগ্ন চারার গোড়ার অংশ মাটির উপরে থাকে। চারা রোপণের সময় মাটি নিচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। রোপণের পর চারায় খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পানি দিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

নারিকেল গাছে প্রচুর সারের প্রয়োজন হয়। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হয়। অন্যান্য সারের তুলনায় নারিকেল গাছে পটাশ জাতীয় সারের মাত্রা বেশি লাগে। এ সারের অভাবে ফল দেহিতে আসে, ফুল ঝরে যায় ও রোগের প্রকোপ বাড়ে। প্রতি বছর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর উর্ধে
গোবর (কেজি)	১০	১৫	২০	২৫	৩০	৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০	৪০০	৮০০	১০০০	১২০০	১৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	১০০	২০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭৫০
এমওপি(গ্রাম)	৪০০	৮০০	১৫০০	২০০০	২৫০০	৩০০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিংক সালফেট(গ্রাম)	৪০	৬০	৮০	১০০	১৫০	২০০
বরিক এসিড (গ্রাম)	১০	১৫	২০	৩০	৪০	৫০

দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তিতে অর্ধেক সার মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি অর্ধেক সার মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে গাছের গোড়া থেকে চতুর্দিকে ১.০ মিটার জায়গা বাদ দিয়ে ১.০-২.৫ মিটার দূর পর্যন্ত মাটিতে ২০ -৩০ সেমি গভীরে প্রয়োগ করতে হবে। সার দেয়ার পর মাটি কুপিয়ে দিতে হবে। এ সময় মাটিতে রস কম থাকলে অবশ্যই সেচ দেয়া প্রয়োজন। বেশি বৃষ্টিপাত বা বেশি শুষ্কতার সময় সার প্রয়োগ ঠিক হবে না।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

নারিকেল ফসলের উপর সেচ ও নিষ্কাশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে সঠিকভাবে সেচ দিলে ফলন ৭৫% পর্যন্ত বেড়ে যায়। শুষ্ক মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর এবং গাছে সার প্রয়োগের পর পানি সেচ দিতে হবে। বেসিন এবং প্রাচীর এ দুই পদ্ধতির সাহায্যে সেচ প্রদান করা যায়। তবে প্রাচীর পদ্ধতিতে ফলন ভাল হয়। বর্ষা মৌসুমে গাছের গোড়ায় যেন পানি দাঁড়াতে না পারে তার জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা দরকার।

গাছ পরিষ্কার করা বা ঝুরানো

নারিকেল গাছের তাজা পাতা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গাছের পাতা হলুদ হয়ে শুকিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ঝরে পড়বে। তবে গাছের মাথায় অতিরিক্ত ময়লা-আবর্জনা জমলে বা গঞ্জর পোকায় আক্রান্ত হলে তা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। আমাদের দেশে নারিকেল উৎপাদিত এলাকায় বছরে একবার নারিকেল গাছ ঝুরানোর প্রচলন রয়েছে এবং অনেকেই তা আবশ্যিক মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা গাছ ঝুরানোর কাজ করা হলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফল সংগ্রহ

ফুল ফোটার ১১-১২ মাস পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ডাব হিসেবে খাওয়ার জন্য ৫-৭ মাস বয়সী ফল সংগ্রহ করা হয়। সারা বছরই কম বেশি নারিকেল সংগ্রহ করা যায়। তবে বছরে দু'বার (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) এবং (ভাদ্র-কার্তিক) মাসে বেশির ভাগ গাছ থেকে নারিকেল সংগ্রহ করা হয়। নারিকেল পরিপক্ব হলে বাদামী রং ধারণ করে এবং ঝাঁকি দিলে পানি নড়ে।

অন্যান্য পরিচর্যা

বাড রট/কুঁড়ি পচা

ফাইটোফথোরা নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে কচি পাতা প্রথমে বিবর্ণ হয়ে যায় ওপরে বাদামী বর্ণ ধারণ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে ভিতর থেকে বাইরের দিকে বয়স্ক পাতা একের পর এক আক্রান্ত হতে থাকে। আক্রান্ত পাতা আস্তে আস্তে মারা যায় ও এক সময় কেন্দ্রস্থলের সকল পাতার বোঁটা আলাগা হয়ে ঝুলে পড়ে। এ অবস্থা পাছটিকে কেন্দ্রস্থলে পাতাশূন্য মনে হয়।



কুঁড়ি পচা রোগাক্রান্ত নারিকেল পাছ

প্রতিকার

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ৪-৫ গ্রাম সিকিউর মিশিয়ে কুঁড়ির গোড়ায় স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। এ রোগে আক্রান্ত মৃত প্রায় পাছকে কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফল পচা রোগ

এ রোগের কারণে অপরিপক্ব বা কচি ফল পচে যায়। রোগের আক্রমণের ফলে গোড়ার দিক বিবর্ণ হয়ে যায়। পরবর্তী সময় বাদামী রং ধারণ করে এবং ফলের গায়ে সংক্রমিত স্থানে ছত্রাকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিকার

প্রতিলিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা ম্যানকোজেব মিশিয়ে আক্রান্ত ফলে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। রোগের আক্রমণ রোধ করতে হলে গাছ পরিষ্কার রাখতে হবে।

পাতার ব্লাইট/দাগ পড়া

এ রোগের আক্রমণে পাতায় ধূসর বাদামী বর্ণের কিনারাসহ হলুদ বাদামী বর্ণের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ডিম্বাকার ও এক সেমি লম্বা। পরবর্তী সময়ে দাগগুলো ধূসর বর্ণের হয় ও পাতার শিরার সমান্তরাল প্রসারিত হতে থাকে এবং সবশেষে সব দাগগুলো একত্রিত হয়ে পুরো পাতাটাই ছেয়ে ফেলে। চারা এবং ছোট গাছ এ রোগের প্রতি বেশি সংবেদনশীল।

প্রতিকার

পরিমিত সার প্রয়োগ করলেও যথা সময়ে সেচ এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগের আক্রমণ কম হয়। আক্রান্ত গাছে ব্যাভিস্টিন/কারবেন্ডাজিম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

রস ঝরা/স্টেম ব্রিডিং

গাছের আক্রান্ত অংশ দিয়ে লালচে বাদামী বর্ণের রস নির্গত হয়। যে স্থান দিয়ে রস গড়িয়ে নামে সে স্থানে রস ঝরার দাগ শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। সংক্রমণ স্থানের বাকলও শুকিয়ে কালো হয়ে যায় এবং ভিতরে গভীর গর্তের সৃষ্টি করে।

প্রতিকার

এ রোগে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত অংশ ভালভাবে ছুরি দিয়ে চেঁছে তুলে ফেলে বোর্দো পেস্টের প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে। গাছে গর্ত হয়ে গেলে পিচ বা সিমেন্ট দ্বারা গর্ত পূরণ করে দিতে হবে।

গম্বার পোকা

পূর্ণ বয়স্ক পোকা গাছের মাথার পাতার কচি অগ্রভাগ ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং কচি নরম শাঁস খেয়ে ফেলে। আক্রান্ত গাছের নতুন পাতা যখন বড় হয় তখন পাতার

আগা কাঁচি দিয়ে কাটার মত দেখায়। কোন কোন সময় পাতার মধ্য শিরাটিও কাটা পড়ে যায়। ফলে পাতাটি ভেঙ্গে পড়ে। আক্রমণ তীব্র হলে নতুন পাতা বের হতে পারে না। এতে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায় এবং এক পর্যায়ে গাছ মারা যায়। গাছের নিচে বা আশে পাশে গোবরের টিবি থাকলে এ পোকা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার

আক্রান্ত গাছের ছিদ্র পথে লোহার শিক ঢুকিয়ে সহজেই পোকা বের করা যায়। ছিদ্র পথে সিরিঞ্জ দিয়ে কীটনাশক প্রবেশ করালে পোকা মারা যাবে। এরপর ছিদ্রটি পুড়িয়ে বা কাদা মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এ পোকাগুলো পচা আবর্জনা, গোবর, মরা কাঠের গুঁড়িতে প্রজনন ঘটায় ও ডিম পাড়ে। তাই এ সকল প্রজননস্থল ধ্বংস করতে হবে।

বহুচা বা চিটা নারিকেল সৃষ্টি হওয়া

অনেক সময় নারিকেল গাছে বহুচা বা শাঁসবিহীন ফল উৎপাদিত হয়। বহুচা ফলের বাইরের খোসা ও খোল স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠে কিন্তু ভিতরের পানি বা শাঁস থাকে না এবং কোন জ্রণ থাকে না। কখনও শুধু পানি থাকে কিন্তু শাঁস থাকে না। আবার কখনও আংশিক শাঁস থাকে কিন্তু পানি থাকে না। একে চিটা নারিকেল বলা হয়।

প্রতিকার

বরিক এসিড (৫০ গ্রাম/গাছ) ও এমোনিয়াম মলিবিডেট গাছে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। সুমম সার ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।